আ লা প

মঈন চৌধুরী – সলিমুল্লাহ খান

সম্পাদনা

শওকত হোসেন

প্রসঙ্গ দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব

[জুলাই ৬, ২০০৭ শুক্রবার সকাল ১১.৩০ টা। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষথেকে আজ আমরা বসেছি একটা বিষয়ে বুঝবার জন্য। বিষয়টি হল 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব'। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা বাংলাদেশের দু-জন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, কবি-প্রাবন্ধিক মঈন চৌধুরী এবং গবেষক-লেখক সলিমুল্লাহ খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব, 'দুর্নীতি' বিষয়টিকে তারা কীভাবে দেখেন; এর আগাগোড়া তথা এর পরম্পরা ও কার্যকারিতার বিভিন্ন দিকগুলো কী, এর জন্ম, অস্তিত্ব রক্ষা ও সংক্রমণের কাজটি-ই-বা কীভাবে ঘটে।]

হালখাতা

আসলে দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে দুর্নীতি সম্পর্কে জানা দরকার; সেদিক থেকে প্রথমে মঈন চৌধুরীর কাছথেকে জানতে চাই, দুর্নীতি বলতে আপনি কী বোঝেন?

মঈন চৌধুরী

'দুর্নীতি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে 'নীতি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী। এই 'নীতি' শব্দকে কেন্দ্র করে 'দর্শন ও তত্ত্ব' কী ধরনের জ্ঞানসীমায় অবস্থান করছে, তার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দুর্নীতির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে আমাদের মনস্তত্ত্ব, আমাদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্যারাডাইম বা ছক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা হচ্ছে না বললেই চলে। দুর্নীতি যে 'নীতি' থেকে সরে আসা, এ সত্যটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন সবার আগে ।

হালখাতা

আমরা মঈন চৌধুরীর প্রারম্ভিক বক্তব্য শুনলাম। জনাব চৌধুরীর কথার রেশ ধরে সলিমুল্লাহ খানের কাছথেকে এবার জানতে চাইব, 'দুর্নীতি' বলতে আপনি কী বোঝেন?

সলিমুল্লাহ খান

দুর্নীতি নিয়ে সমাজে এখন কয়েকটা আলোচনা চলছে। আমার মনে হয় সে সব বিষয়কে বাদ দিয়ে কিংবা সে সব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু দুর্নীতিকে আলাদা করে বোঝা যাবে না। আমি এখান থেকেই শুরু করতে চাই। 'দুর্নীতি' কথাটা আমরা ব্যবহার করছি বিশেষ বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় গিয়ে মানুষ যখন অপরাধ করে তখন আমরা তাকে 'অপরাধ' না বলে 'দুর্নীতি' বলছি, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে 'দুর্নীতি' কথাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। অর্থাৎ সরিষার মধ্যেই ভূত। আমরা যে

পদ্ধতিতে দুর্নীতি দূর করতে চাচ্ছি, সে পদ্ধতির ভেতরেই দুর্নীতি আছে কিনা সেটাও আমাদের দেখতে হবে।

হালখাতা

আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাচ্ছি, 'দুর্নীতি' বিষয়টি আসলে কী? মঈন চৌধুরী বললেন, "দুর্নীতি যে 'নীতি' থেকে সরে আসা, এ সত্যটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন সবার আগে"। আপনার মতে এই সুনীতিই-বা কী?

সলিমুল্লাহ খান

আমি সে দিকেই যাচ্ছি। রাজনৈতিক ক্ষমতায় থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি'র সময়ে কী করছিলেন?; বিরোধী দলের অফিসে গোপনে রেকর্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে আমেরিকান সমাজের বুদ্ধিমান কয়েকজন সাংবাদিক খবরটা ফাঁস করে দেন। ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। বিরোধী দলের অফিসে গোপনে রেকর্ডের এই ব্যবস্থাকে আমরা 'রাজনৈতিক দুর্নীতি' বলতে পারি। আরেক ধরনের দুর্নীতি হল, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনি আপনার স্বজনদের সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন, আপনি তাদের ক্ষমতায় বসাচ্ছেন– এটাও এক ধরনের দুর্নীতি। আরেক ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, সেটা 'চাঁদাবাজি'। এটা এমন এক দুর্নীতি– যা সাধারণ লোকে করলে হয় চুরি আর বড়লোকে করলে সেটা হয় চাঁদাবাজি, না হয় দুর্নীতি হয়ে যায়। এখানে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। সেজন্য বলবো, দুটি জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। একটি হল সম্পদ উপার্জনের যেসব পদ্ধতি আছে সেগুলোকে আমরা বলছি নীতিসম্মত। যেমন ধরেন আপনি একটা কারখানা দিলেন, সেখানে বিনিয়োগ করলেন, সেখানে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে আপনি লাভবান হলেন, আপনি শিল্পপতি হলেন– আবার আপনি নিজে শিল্পপ্রতিষ্ঠান না দিয়ে মাস্তান নিয়ে আরেকজনেরটা দখল করলেন এবং আপনি নিজেকে শিল্পপতি হিসেবে দাবি করলেন, বা সমাজে সেটা প্রতিষ্ঠিত করলেন– তখন আপনি হলেন 'শিল্পদস্যু', 'ভূমিদস্যু'– এরকম আরও অনেক শব্দ আছে। কাজেই দুর্নীতি কিভাবে নীতি হিসেবে প্রচারিত হয় তার বহু পথ আছে। আমার কথা হল, যে উপার্জনের নীতিকে আমরা সঠিক উপার্জনের নীতি বলছি সেটা আসলে সুনীতি কিনা সেটাও জিজ্ঞাস্য।

হালখাতা

তাহলে জনগণ যেটাকে সুনীতি বলে জানে, তাদের সেই জানা অর্থাৎ কথিত সুনীতি-কে আপনি কীভাবে বিবেচনা করবেন?

সলিমুল্লাহ খান

বলছি। আমার কথার ভেতরে আপনার প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে আশা করি। কথা হলো রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থেকে যে অতিরিক্ত উপার্জন করা হয়, সেই অতিরিক্ত উপার্জনের পন্থাকে আমাদের সমাজে সম্ভবত দুর্নীতি বলা হচ্ছে। ধরা যাক আমরা যে একটা শব্দ বলছি 'কালো টাকা'। আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা কালোটাকা কী ? এটা কি দেখতে কালো? সে বলেছে না এটা দেখতে কালো নয়। তাহলে এটাকে কালো টাকা বলছি কেন? সে বলছে, এ টাকার কোনো ট্যাক্স দেয়া হয় না। সে জন্য এ টাকাকে কালো টাকা বলা হয়। ট্যাক্স দিলে এ কালো টাকা সাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকার ট্যাক্স দিলে রাষ্ট্র আপনার দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলবে না। এটা নীতি হয়ে যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে নীতি আর দুর্নীতির পার্থক্য একটা সুতার সমান। সেখানে আমাদের ভাবতে হবে, যেতে হবে গোড়ায়। অত্যন্ত জোরালোভাবে আমি আবারও বলতে চাই, যে নীতির ভিত্তিতে দুর্নীতির সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেই নীতিই সুনীতি কিনা ভাবতে হবে!

হালখাতা

সলিমুল্লাহ খান দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে নীতির প্রসঙ্গও যেভাবে টানলেন অর্থাৎ গণমানুষ যে নীতির কথা সাধারণভাবে জানেন, সেই নীতিকেই তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করলেন যে, আসলে সেটাই সুনীতি কিনা।

মঈন চৌধুরী

দুর্নীতি বিষয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে নীতি বা সুনীতি প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ খান যা বললেন, তা দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশ করতে আমাদের খুবই সাহায্য করবে। আমাদের রাষ্ট্র বা সমাজ স্বাধীনতার পর গত ৩৫/৩৬ বছরে দুর্নীতিগ্রস্ত হল, নাকি এই প্রক্রিয়া আরো অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। এবং সেই বিশ্লেষণে গেলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকেই নেড়েচেড়ে দেখতে হয়। সমাজ-মনস্তত্ত্বের গহীনে যাবার একমাত্র পথই হল ভাষার বিশ্লেষণ, কারণ আমরা জানি যে আমাদের 'মন' নামক ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা অস্তিত্বটি আসলে ভাষার তৈরি। ব্যাপারটি গ্রাহ্য করে দার্শনিক হাইডেগার বলেছেন – The language is the home of Being and man dwells in this house. অর্থাৎ ভাবই ভাষার বাড়ি আর মানুষ এই বাড়িতেই বসবাস করে।

আমাদের ভাষার বিশ্লেষণে দেখতে পাব যে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদির মতো অনেক শব্দই আমাদের ভাষায় ঐতিহাসিকভাবে ছিল। 'দুর্নীতিবাজ', 'ঘুষখোর' ইত্যাদির মতো শব্দও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ', 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা', ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক প্রবাদ-প্রবচনও আমাদের দুর্নীতিবিষয়ক ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ করছে। কিন্তু সেখানে ভাষাকেন্দ্রিক একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। ছিঁচকে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদিকে আমরা যে মাত্রায় অন্যায় বা পাপ হিসাবে গণ্য করি, ঠিক সে মাত্রায় 'দুর্নীতি' বা 'ঘুষ খাওয়া'-কে অন্যায় বা পাপ ভাবি না। সমাজের 'অসাধারণ' লোকজন কিছুটা দুর্নীতি করবে, ঘুষ খাবে– এমন ব্যাপার যেন আমাদের সমাজে অনেকটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। অনেক মেয়ের

বাবা মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে ভালোভাবে জানতে চান ছেলের 'উপরি আয় কত', । আমাদের ইতিহাসেও তাই 'দারোগা', 'পুলিশ', 'সি এস পি', 'ইঞ্জিনিয়র' ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনই দুর্নীতিবাজ হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এই পুরো ব্যাপারটা আসলে আর কিছু নয়, এটি মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়; যে বিপর্যয় আমাদের জাতীয় চরিত্রকে এবং সামাজিক দর্শনকেই উপস্থাপন করে!

হালখাতা

আমাদের প্রশ্ন, চুরি, ডাকাতি এবং দুর্নীতি– এগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কী?

সলিমুল্লাহ খান

আমি মনে করি, মঈন চৌধুরী আপনি যে দর্শন, মনস্তত্ত্ব– এরকম বড় বড় শব্দ উত্থাপন করছেন, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কেচোঁ খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি বলছি কেঁচো হচ্ছে দুর্নীতি আর সাপ হচ্ছে নীতি। কেঁচো দেখতে বিশ্রী, গা ঘিন ঘিন করে আর সাপ ছোবল মেরে হত্যা করতে পারে। আমাদের দেশে যে দুর্নীতির ইতিহাস আমরা দেখছি, বিশেষ করে সম্পত্তি-দুর্নীতির যেসব ঘটনা আমরা দেখছি সেটা একদিনের নয়– কারণ আমাদের এই রাষ্ট্রটা তৈরি হয়েছে ৩৫/৩৬ বছর আগে, তার আগে এখানে যারা রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ছিল অর্থাৎ প্রধান জাতি হিসেবে যারা ছিল, আপনি বাঙালি মুসলমানের কথাই বলেন– আর শওকতের মতো আপনারও যদি মুসলমান শব্দটি নিয়ে আপত্তি থাকে, তাহলে বাঙালি বললেই চলে– তাতে কিছু যায় আসে না। যা হোক মূল কথা হল এই সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতার ইতিহাস বেশি দিনের নয়, কিন্তু এই সমাজে মানুষের ইতিহাস অনেক দিনের।

আমরা আজকের আলোচনায় বিশেষ করে যে দুর্নীতির কথা বলছি, সেটা হল রাষ্ট্র-ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত দুর্নীতি। আমি বলব চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-ছিনতাই, খুন-অপরাধ যখন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, জনগণের আড়াল করা হয়, তখন তাকে দুর্নীতি বলা হচ্ছে। অবশ্য এরূপ কোনো সংজ্ঞা আমি দেখিনি কোনো বইয়ে বা কাগজে। আমি বলবো, সব ধরনের চুরিকে প্লেইন চুরি বলতে পারলে, ডাকাতিকে ডাকাতি বলতে পারলে ভালোই হত। আপনি জানেন আমাদের পেনাল কোডে রবারি এবং ডেকয়টি দুটি আলাদা অপরাধ। এটা লিখেছিলেন ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে। ওনারা রবারি এবং ডাকাতির পার্থক্য করেছিলেন কেন? ওনারা বলেছেন, পাঁচ জনের কম মানুষ মিলে করলে রবারি আর পাঁচ জনের অধিক মানুষ মিলে করলে সেটা ডাকাতি। কাজেই আমার ধারণা আপনারা দার্শনিকেরা মিলে দুর্নীতির একটা সংজ্ঞা তৈরি করবেন– এটা আমার আশা।

হালখাতা

মঈন ভাই নিজেকে দার্শনিক মনে করেন কি-না সেটা একটা ব্যাপার, যদিও খান ভাই তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথার শেষ কথাটিতে মঈন চৌধুরীকে দার্শনিক বলে সম্বোধন করলেন। এবার চৌধুরীর বক্তব্য...

মঈন চৌধুরী

আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে কখনো দার্শনিক মনে করি না। আমি দর্শন পাঠ করতে পছন্দ করি, দর্শন চর্চা করি। সলিমুল্লাহ খান হয়তো দার্শনিকদের কাছেই দুর্নীতির যথার্থ সংজ্ঞা সৃষ্টির আশা ব্যক্ত করেছেন। আমি দুর্নীতি নিয়ে আমাদের সমাজের পেক্ষাপটে একটি কথা বলতে পারি, সেটা কোনো দর্শন নয়, সেটা একটি সামাজিক সত্য– তা হল, আজকাল যেন চোর বললে কারও মানসম্মান যায় না, বরং সম্মান বেড়ে যায়।

সলিমুল্লাহ খান

মঈন ভাই'র অনেক বিষয়ের সঙ্গে হয়তো আমি একমত নই কিন্তু দুর্নীতিবাজ শব্দটি যে প্রায় একটি সম্মানজনক শব্দে পরিণত হয়েছে, সে-ব্যপারে তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং এটা রীতিমতো আতঙ্কিত হওয়ার মতো ব্যাপার, এই জন্যে যে, অন্যায়কে আইন করে প্রতিরোধ করা যায় কেবল তখনই, যখন সেটাকে সমাজের মানুষ অন্যায় মনে করে এবং যদি সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে। পক্ষান্তরে যদি দুর্নীতির মতো একটি বিষয়কে সমাজ খারাপ কিছু মনে না করে, যেমন ঘুষকে বা যৌতুককে এই সমাজ খারাপ মনে করে না, তাহলে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এই সমাজ থেকে কখনোই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়; মূল কথা হল আইন কার্যকরী হবে তখনই, যখন সমাজটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঐ আইন মেনে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

হালখাতা

এবার পুনরায় আসা যাক মঈন ভাই'র কাছে। দুর্নীতি একটি ক্ষতিকর বা নেগেটিভ ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে সমাজ কেন তাকে পজিটিভ হিসেবে ভাবছে? এভাবে ভাবনার ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে থাকে? এ নিয়ে যদি আমাদের বিস্তারিতভাবে কিছু বলেন। এর পেছনে কি শুধুই অভাব কাজ করছে নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে? অন্য কোনো কারণ থেকে থাকলে, তার পটভূমি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি...।

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, দুর্নীতি একটি নেগেটিভ শব্দ না হয়ে এটি প্রায় পজিটিভ শব্দ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকানো দরকার, দরকার দুটি কারণে; এক. চুরি, ডাকাতি এসবের সাথে 'অস্তিত্বের সঙ্কট' জড়িত কিনা; দুই. আর এই অস্তিত্বের সঙ্গে 'সংকট' ইতিহাসের কোনো এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল কিনা। আমাদের এই বঙ্গদেশ তৈরি হয়েছিল বঙ্গ, হরিকেল, সমতট ইত্যাদি জনপদের সমন্বয়ে। আমাদের আদিম বা প্রাচীন বঙ্গে যে জনগোষ্ঠী বসবাস করত তাদের বলা হত বঙ্গাল, পরে দ্রাবিড়রা এখানে আসেন এবং তখন তারা একটি কৌম সমাজের অধীনে ছিলেন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব-সংকট কখন শুরু হল? যখন ব্রাহ্মণরা এসে বলতে লাগল যে, আমরা শ্রেষ্ঠ, অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা এবং উঁচু ঘোষণা করে

বলতে লাগল যে, আমাদের পুজো দাও– এটা করো, সেটা করো– তখন থেকে আমাদের সমাজে শুরু হল অস্তিত্ব-সংকট। তখন থেকেই আমাদের সমাজে বর্ণভেদ এল এবং নিচুজাত তৈরি হল। আর ব্রাহ্মণদের খুশি করতে তাদের চারপাশে তৈরি হল চেলা-চামুণ্ডা শ্রেণীর। আমাদের সমাজে দুর্নীতির বীজ আমি মনে করি তখনই বপন করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের সমাজে অফিসের পিয়ন, কেরানি, গ্রামের কৃষক, মাওলানা সাহেব থেকে আরম্ভ করে একজন ইউ.এন.ও, ডিসি, সরকারের উঁচু লেভেলের কর্মকর্তা বা অনেক পুঁজি দিয়ে যিনি ব্যবসা করেন এদের অনেকেই দুর্নীতিবাজ। আমি বলছি না যে, প্রতিটি লোকই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে আমার অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই দুর্নীতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই জীবন-যাপন করে আর এই দুর্নীতির সঙ্গে আমি মনে করি অস্তিত্ব-সংকট জড়িত। একজন কৃষক বা কেরানির অস্তিত্ব-সংকট হল দৈনন্দিন থাকা-খাওয়ার সংকট, অন্যদিকে টাকার কুমিরদের সংকট হল জবরদখল করে দখলকৃত সম্পদ রক্ষা করা। সম্পদ রক্ষার জন্য সে তৈরি করে মাস্তানবাহিনী, তারা হয় পত্রিকার মালিক, তারা টি.ভি চ্যানেল চালু করে। এবং এরাই রাজনৈতিক শক্তি বা power structure-এর মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে এভাবে নিজে দুর্নীতি করছে এবং দুর্নীতির জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রক্রিয়ায় একটা দুর্নীতি আরেকটা দুর্নীতি সৃষ্টি করছে, এটা অনেকটা জাঁক লাকার একটা সিগনিফায়ার যেমন আরেকটা সিগনিফায়ার সৃষ্টি করে, তেমনি একটা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি করছে আরেকটি দুর্নীতি।

হালখাতা

এই ফাঁকে আমি একটু বলি, খান ভাই আপনি তো জাক লাকাঁ অর্থাৎ আপনার জবানী অনুসারে জাক লাকাঁনের দর্শনচর্চা করেছেন ও করছেন, 'লাকাঁ বিদ্যালয়' নামে একটি সংগঠনও তৈরি করেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি– 'জাক লাকাঁর একটা সিগনিফায়ার যেভাবে আরেকটা সিগনিফায়ার সৃষ্টি করে' তার সঙ্গে 'একটা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার ফলে আরেকটি দুর্নীতি সৃষ্টি হয়'–এর মিলের যে-কথা মঈন ভাই বললেন এব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

সলিমুল্লাহ খান

মঈন ভাই'র সঙ্গে আমি একমত, তাকে ধন্যবাদ জানাই ।

মঈন চৌধুরী

এখানে লক্ষণীয় যে ভাষার প্রলেপ দিয়ে দুর্নীতিকে নানা রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন চুরি, চুরি আবার বহুরকম– ছিঁচকে চুরি, পুকুর চুরি। এর উপরের ধাপে আছে ডাকাতি– এরপর দেখা যাচ্ছে হাইজ্যাক। শব্দটি বাংলাভাষায় ছিল না, ছিনতাই শব্দটিও আমাদের ভাষায় ছিল না– পরে হাইজ্যাক আসল, হাইজ্যাক থেকে ছিনতাই আসল। আমার মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন 'দুর্নীতিবাজ' বলে কোনো শব্দ আমাদের সমাজে খুব একটা প্রচলিত ছিল না– তখন 'ঘুষখোর' শব্দটি বেশ প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল যে অমুকে ঘুষ খায় অমুকে ঘুষ

খায় না– অর্থাৎ অমুকে অসাধু লোক আর অমুকে সাধু লোক। তার অনেক পরে দুর্নীতিবাজ শব্দটি প্রচলিত হল– এতেই বোঝা যাচ্ছে ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক একটি বিষয়ের সম্পর্ক আছে।

সলিমুল্লাহ খান

মানুষ চুরি করে কেন! প্রশ্ন করা হল তুমি চুরি কর কেন? বলে যে সমাজে কাজ নেই। বলে যে আমার অস্তিত্বের সংকট, খেতে পরতে পারছি না তাই চুরি করি একটু বেঁচে থাকার জন্য । মানুষ আসলে দু'কারণে চুরি করে; অভাবে পড়লে মানুষ চুরি করে আর মানুষের স্বভাব নষ্ট হলে চুরি করে। যেমন– অফিসে ছোট চাকরি করে,তাকে টু-পাইস কামাই করতে হয়– হোটেলের বেয়ারা, তাকে বকসিশ দিতে হয়; বলা হয় যে, এর আয়-রোজগার কম বলে এগুলো করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল বড় দুর্নীতির মতো এগুলোও দুর্নীতি, যা আমাদের সমাজে প্রায় বৈধতা পেয়ে গেছে। ছোট ছোট দুর্নীতিকে আমাদের সমাজে ঘুষ বলা হয়, বকসিশও বলা হয়। এগুলো সমাজের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমার কথা হল এগুলো না হয় ছোট ছোট দুর্নীতি, কিন্তু এই যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি এগুলো কী অভাব থেকে করেছে! নিশ্চয়ই না, এগুলো স্বভাবের কারণেই করেছে। মানুষের কত সম্পদ দরকার? মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কিংবা আরাম-আয়েসের জন্যও এত ধনসম্পদের প্রয়োজন হয় না– কাজেই এসব দুর্নীতি অভাবের কারণে নয় স্বভাবের দোষেই এ-কাজ করা হয়ে থাকে। মানুষ আরও উপার্জনের বাসনায় আরও সম্পদ চায়। কথা আছে টাকায় টাকা আনে– এটাকেই মঈন ভাই একটু আগে লাকানের শব্দ দিয়ে বললেন, সিগনিফায়ার; আসল দুর্নীতি একজন ব্যক্তির কাজ নয়– দুর্নীতি একটা জগৎ। ইংরেজিতে বলা যায় সিস্টেম।

হালখাতা

বাংলাদেশের জনগণের মনে দুর্নীতি নিয়ে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির বিপরীত বিষয় 'নীতি' বা 'মূলনীতি' কী? অর্থাৎ কোন মূলনীতি থেকে চ্যুতিকে তারা দুর্নীতি বলছে?

সলিমুল্লাহ খান

দুর্নীতির পাশাপাশি আরেকটি কথা, সেটা মূলনীতি– মূলনীতিটা কোথায়? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি সংবিধান পাশ হয়েছিল ১৯৭২ সালে– সেখানে ছিল রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তা– তাজুদ্দিন সাহেব বলেছিলেন তিনটার কথা, বঙ্গবন্ধুর আমলে ৪টা হয়েছে– জাতীয়তা যোগ হয়েছে– পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের সময় সেটাকে কিছুটা বদলানো হয়েছে– আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্ভবত সংবিধানের ১২ নম্বর ধারায়, পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকেই রায়টা এসেছিল যে, ধর্মের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবহার করা হবে না। জিয়াউর রহমানের সময় সংশোধনীর মাধ্যমে এটা তুলে দেয়া হয়। আমি কথাটি বলছি কোনটি নীতি আর কোনটি দুর্নীতি– তা বোঝার জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে, মূলনীতিকে পরিবর্তন না করলে ধর্মকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না– তাই জিয়াউর রহমান এই মূলনীতি তুলে দিলেন। তার মানে তিনি চান ধর্মকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে। আমি

মনে করি এই যে মূলনীতির পরিবর্তন করা– এটা যেমন দুর্নীতি – একইভাবে আপনি সরকারি চাকরি করে বেতন পান ৫,০০০/- টাকা অথচ আপনার সংসারে দরকার ২০,০০০/- টাকা– বলা হল বাকি টাকা আপনি ঘুষ খেয়ে যোগাড় করেন– এটাও দুর্নীতি। অর্থাৎ কোচিং করা, টিউশনি করা– এগুলো শিক্ষকদের করতে বলা হচ্ছে। রাষ্ট্রই যদি বলে তোমরা এগুলো করো তাহলে আমি কি সেগুলোকে দুর্নীতি বলতে পারব? রাষ্ট্র বলছে তুমি ধর্মকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে, রাষ্ট্র যদি তাকে বৈধতা দিয়ে দেয় সেখানে আমি কি কিছু করতে পারছি না!

এখন মূল কথায় আসি, আপনার মূলনীতিতেই আছে আপনি প্রাইভেট প্রোপার্টির মালিক হতে পারবেন; আমি মনে করি এটা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত মূলনীতি। প্রোপার্টি হতে হবে দশের, আল্লাহর। আমরা তার জিম্মাদার মাত্র। সেই দশের প্রপার্টি ব্যক্তির নামে লিখিত করে দিয়ে দেওয়াটা একটা বড় ধরনের দুর্নীতি। অথচ এই দুর্নীতিকেই রাষ্ট্র ও সমাজ তার সুনীতি মনে করে। প্রাইভেট প্রপার্টির এই অধিকারের কথা আমাদের সংবিধানেই আছে– কাজেই এটা একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সংবিধান; সকল দুর্নীতির এটা গোড়াঘর, এই গোড়ায় হাত দেয়া দরকার কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক বলে আমরা গোড়ায় হাত দেই না।

হালখাতা

সেটা তো আছেই। কিন্তু যেটাকে আপনি দুর্নীতিগ্রস্ত সংবিধান বলছেন এই সংবিধানকেও তো প্রতিমুহূর্তে হত্যা করে দুর্নীতি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

সলিমুল্লাহ খান

এ ধরনের সংবিধানে প্রাইভেট প্রপার্টির অধিকার দেয়া হয়েছে, এই সংবিধান অনুসারেও বলা আছে মজুরের পারিশ্রমিক সঠিক সময়ে দিয়ে দাও– কিন্তু সেই পারিশ্রমিকের টাকা সঠিক সময়ে না দিয়ে মালিকপক্ষ ২ মাস ঐ টাকা ব্যাংকে রেখে দিল এবং ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত সুদ পেল– এই যে সুদের টাকা সে অর্জন করল এটা দুর্নীতি। কাজেই দুর্নীতির সংজ্ঞা নতুনভাবে দিতে হবে– দুর্নীতির নানা স্তর রয়েছে, সেই দিকগুলো ভেবে বহুমুখী চিন্তাকে মাথায় রেখে সব ধরনের দুর্নীতিকেই হিসাবে আনা জরুরি। যেমন– সরকার ঘোষণা দিল, বছরে বেশ কিছুসংখ্যক বই কেনা হবে– এবং সেই জন্য 'বই ক্রয় কমিটি' গঠন করা হলো– বাস্তবে দেখা গেল ক্রয়ের তালিকায় মন্দ বই ঢুকিয়ে দেয়া হল আর ভালো বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল না– এতে করে ভালো বইয়ের প্রকাশকরা বিদায় নিতে বাধ্য হল– এটা কি দুর্নীতি নয়? বই ক্রয়ের ঐ কমিটিতে সুশীল সমাজের লোকজন ছিলেন– কাজেই সরাসরি বলা যায় সুশীল সমাজের এই লোকদের দ্বারাই বই কেনার মতো কাজেও দুর্নীতি সংক্রমিত হল। এর কারণ হল সুশীল সমাজটাও দুর্নীতিগ্রস্ত। কাজেই দুর্নীতির সংজ্ঞার জন্য আরও বিস্তৃত আকারে ভাববার সময় এসেছে। এতগুলো জিনিস যদি একসাথে আসে তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই দুর্নীতি কি স্বয়ং আপনা থেকে এসেছে নাকি এর আসার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। সেই কারণের দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, আপনি যে হাজার বছরের বাঙালি জাতির দুর্নীতির ইতিহাসের কথা উল্লেখ করলেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর আমার ভাষা নেই–

তবে আমি মনে করি আমরা যদি আলোচনার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি যেতে চাই– তাহলে সমসাময়িক দুর্নীতির আগাগোড়া নিয়েই আমাদের আলোচনা করা দরকার। অন্য কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা দুর্নীতির অতি প্রাচীন বা মধ্য-প্রাচীন কালের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারব। ইতিহাসের প্রসঙ্গ যখন তুললেন তখন ইতিহাসের একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। ইংলন্ড কী-করে বাংলাদেশ দখল করল– ইংলন্ডের এখন যারা বিদগ্ধ ঐতিহাসিক তাদের মধ্য থেকে একজনের নাম করা যায় পিটার মার্শাল, ক্যামব্রিজের অধ্যাপক– আরেকজন ক্রিস্টোফার বেইলি; এরা বলেন যে, বাংলা দখল করার কোনো পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। এটা হল দুর্নীতির ছক। কী করে দুর্নীতির ছক? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী, তারা তাদের বুদ্ধি দিয়ে, কৌশল দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে বাংলা দখল করেছে, ইংলন্ড সেটা জেনেছে অনেক পরে। কাজেই এটাকে ইংলন্ডের অপরাধ বলা যাবে না, এটা নিশ্চয়ই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় ধরনের দুর্নীতি। আমি বলব এসব অজুহাত দেখিয়েও কি ইংলন্ড দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই পাবে? পাবে না। কাজেই খুঁজে বের করতে হবে ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাসকে, তাহলে দুর্নীতির আসল চেহারাটা আমরা দেখতে পাব।

প্রসঙ্গক্রমে আমি নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটির কথা বলব, এদের মধ্যে কোনোরকম দুর্নীতি নেই– অথবা তারা দেশের জন্য একশত ভাগ নিয়োজিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে– আর এমনি দুর্নীতি হঠাৎ করে এসে গেল এ-কথা সঠিক নয়। বরং আমি বলব দুর্নীতির উৎস খুঁজতে হবে সিভিল সোসাইটির মধ্যে। বঞ্চনা-শোষণের মূলে পদ্ধতিগতভাবে যে অবদমন রয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। সমাজকে অবদমিত অবস্থায় রাখার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বঞ্চনা-শোষণ-নির্যাতনের জায়গায় রাখার ক্ষেত্রে কিংবা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ সৃষ্টি এবং তা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। সেটার সুরাহা করা সবচেয়ে জরুরি কাজ। এই অবদমন শব্দটি মঈন চৌধুরীর মত অনুসারে এক মনোবিশ্লেষণাত্মক শব্দ; এই অবদমন শুধু সেক্সুয়াল নয়– এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক। কাজেই আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটিই সৃষ্টি করেছে অসম বাণিজ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিনিয়োগ। আফ্রিকাসহ অন্যান্য জায়গায় তারা করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নামকাওয়াস্তে মূল্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া– এভাবে যদি আমাদের সহযোগিতা করার কথা বলা হয়– সেটা কি দুর্নীতি নয়? আর এই কাজে আমাদের দেশের মধ্য থেকে যারা সহযোগিতা করে তাদের আমরা বলছি নীতিপরায়ণ। যদি বলি চট্টগ্রাম বন্দরের কথা, যারা বন্দর বিদেশিদের দেয়ার জন্য কাজ করছে তারা যদি মাফ পেয়ে যায়– যারা চট্টগ্রামের পাহাড় কেটেছে তারাও মাফ পেয়ে যায়; তাহলে দেখতে হবে দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতি শুধু একটি দুটি দিক থেকে নয়, এই দুর্নীতি প্রায় সবদিক থেকে যা সরাসরি বলা যায় অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মূলনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। মূল কথা হল, মূলনীতি সঠিক না হলে তার তো পুরোটাই দুর্নীতি!

হালখাতা

ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্যে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সলিমুল্লাহর সাথে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করি না। তবে কথা প্রসঙ্গে যে ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম প্রসঙ্গ উঠে এল, তার প্রেক্ষিতে আমি ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে চাই। ধর্ম সাধারণ মানুষের দর্শন। এবং দর্শন ছাড়া পৃথিবীতে বা আমাদের সমাজে কেউ অবস্থান করতে পারে না। পৃথিবীর সব ধর্মেই 'মানবিকতা'র পক্ষে অনেক কথা আছে, আবার ধর্মকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হচ্ছে দুর্নীতি। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি "আল্লাহ'র সম্পদ" হয়, তারপরও এই সম্পদকে ব্যক্তিগতভাবে ভোগের উদ্দেশ্যে নিজের আয়ত্তে এনে মানুষ দুর্নীতি করে। ধর্ম নিয়ে এর প্রচার সম্পর্কে বলি, ধর্মগুরু বা মাওলানারা বলেন, একটি মসজিদ তৈরি করলে সত্তর হাজার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আবার হজ্জ্ব করে আসলে পবিত্র শিশুর মতো হয়ে আসে। কিন্তু এটা বলা হয় না যে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করলে বা চুরি করলে, সে সম্পদের প্রকৃত মালিক ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করতে পারবেন না। বরং বলা হয়, যত পাপই করা হোক না কেন ইবাদত করলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই যেহেতু গুনাহ মাফ হওয়ার প্রশস্ত পথ খোলা আছে তাই চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, অন্যায়, শোষণ সবকিছু ধর্মের প্রচারগত কারণেও এ সমাজে টিকে আছে। একজন চোর যদি মসজিদ তৈরি করে, সে মসজিদে যে নামাজ হবে না– আল্লাহ কবুল করবেন না– এটা বলা হয় না– বরং মসজিদ তৈরির মাধ্যমে চোর ডাকাতরা সমাজে সম্মানিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে ধর্মের ব্যানারে দুর্নীতিকে চরমভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের সুদখোর, লুটেরা, দুর্নীতিবাজরা দিনদিন তাদের কাজ করেই যাচ্ছে। এই যে ধর্ম, আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর– এসব শব্দেরও মনোবিশ্লেষণ করে দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার খুঁজে দেখা দরকার। সলিমুল্লাহ সুশীল সমাজের কথা বললেন। সলিমুল্লাহল সাথে আমি একমত যে বাংলাদেশ সুশীল সমাজ যা করছে সেটা নীতি না দুর্নীতি সেটাও মাজের দেখতে হবে। বাংলাদেশ সুশীল সমাজের সদস্য হিসেবে আামি যাদের দেখছি, তাদের আমার মনে হয়েছে, তারা সবসময় টেক্সটবুক, ইকোনোমিক্স, স্যোশিওলজি গ্রাহ্য করে সেভাবেই কথা বলেন। এরা বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি সুশীল সমাজের সমাজ তৈরি করেছে– যার সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন আর ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিবাজদের সহযোগিতা করছে কিংবা নিজেরা দুর্নীতি করছে। যে সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলাম– এগুলোই তো দুর্নীতির উৎস– কাজেই তাদের পরামর্শে যে সব দুর্নীতি উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলবে, সেই প্রক্রিয়াও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কাজেই দুর্নীতি দিয়ে দুর্নীতি ঠেকানো যাবে না। এদের শক্তি হল, সমাজে এরা একধরনের নায়ক সেজেছে মিডিয়ার মধ্যদিয়ে; এই নায়কত্ব দিয়েই এরা সমাজে দুর্নীতি করে থাকে। জনগণ মিডিয়াতে এদের দেখতে দেখতে একসময় ভেবে বসে যে, এরাই সমাজের মুক্তিদাতা– জনগণের এই ভুল আস্থার পাত্র হয়ে জনগণের দুর্বলতাকে নিয়ে এরা ব্যক্তিগত ফায়দা লুফে নেয়। অর্থাৎ সুশীলরা হল জনগণ ও দুর্নীতিবাজদের মধ্যস্থতাকারী শ্রেণী। এরা দুর্নীতিবাজদের জনগণের রোষানল থেকে রেহাই পাইয়ে দেয়ার কাজটি খুব সূক্ষ্মভাবে করে থাকে। বাংলাদেশের এমন সুশীলকে দেখেছি এরশাদের পতনের জন্য পল্টনের মাঠে লাফালাফি করতে।

আর তাকেই এরশাদের পতনের পূর্বে দেখেছি দিল্লী গিয়ে এরশাদের পক্ষে কথা বলতে। এদের নাম না বলাই ভালো কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা। কাজেই আমাদের সমাজের গুরু হয়ে যারা বসে আছেন আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী– তারাও দুর্নীতির সঙ্গে কেন এবং কীভাবে জড়িয়ে আছেন বা থাকেন তারও একটি সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হালখাতা
সেটা তো দুর্নীতির কারণ উদঘাটন পদ্ধতি। কিন্তু এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা যাবে কীভাবে?

মঈন চৌধুরী
এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কারণ বেরিয়ে আসবে, সে কারণগুলো দূর করার পদ্ধতিগত প্রতিকারের ব্যবস্থা বের করতে হবে। সেটা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া হবে না। বিক্ষিপ্তভাবে এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা যাবে না। প্রয়োজন একটা আমূল পরিবর্তন।

হালখাতা
এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

সলিমুল্লাহ খান
দুর্নীতি প্রতিকারের একটি উপায় হল– কেউ যেন দুর্নীতি করে কোনোভাবেই প্রশংসিত হতে না পারে। দুর্নীতি যিনি করেন তিনি যেন পুরস্কৃত না হতে পারেন এবং দুর্নীতি-ব্যবস্থাকে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে যদি এম.পি. ইলেকশন করে তাহলে ক্ষমতায় আসাটা যেমন দুর্নীতি তেমনি ক্ষমতায় এসে সে যে কাজগুলো করবে সেটাও দুর্নীতি। যেমন ২০০১ সালের কথিত ইলেকশন ছিল দুর্নীতি। ঢাকায় ও ঢাকার বাহিরে ১৪ আনা এম.পি. ইলেকশন করেনি। সেই ইলেকশনের মধ্যমে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলেন সেটা ছিল দুর্নীতি। আর একটি উদাহরণ, ড. ইউনুস– বসে আছেন ; একপাশে মান্নান ভূঁইয়া, আরেক পাশে সাদেক হোসেন খোকা– এটা ড. ইউনুসের একটি চেহারা। ক্ষুদ্রঋণের কথা বলে চিন্তায় যে দুর্নীতি তিনি করেছেন সেটা অনেক বড় দুর্নীতি হলেও– এ দুটোই দুর্নীতি।

হালখাতা
ড. ইউনুস আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মধ্যদিয়ে– এটা বাংলাদেশের জীবনে সর্বাত্মক সম্মান। আবার যেজন্য তাকে এই প্রাইজ দেয়া হল সেই ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতিকে এদেশের মানুষ কিন্তু ভালোভাবে নেয়নি।

সলিমুল্লাহ খান

তিনি তো ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের বিপদ নিয়ে কিছু বলতে আসেননি। এর পেছনে তার কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে? সেটা একটু চিন্তা করলেই আমরা পেয়ে যাই। সমাজে যারা 'নোবেল প্রাইজ' পান, সমাজে যারা বড় বড় চেহারা নিয়ে বসে আছেন তারা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিতেন তা হলে দুর্নীতি কিছুটা হলেও প্রতিহত করা যেত। কিন্তু বাস্তবে এর চেহারা উল্টা। এরা দুর্নীতি করে সমাজে বড় হচ্ছে আবার বড় হয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের এই প্রক্রিয়া একটি দুর্নীতি। যদিও পৃথিবীর অনেক ভালো কাজের জন্য বিভিন্ন বছর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে কিন্তু ড. ইউনুসের নোবেল প্রাইজ হল দুর্নীতি করার পুরস্কার। এই দুর্নীতির সত্যতা বিশেষ করে গ্রামের গরিব নারীদের কাছথেকে পাওয়া যাবে, যা 'সংবাদ' পত্রিকার মাধ্যমে এ দেশের জনগণও জেনেছে। দেশের মানুষ উৎপাদনশীল একটি দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, ঋণ পাবেন এই আশায় তারা যুদ্ধ করেননি। একদিকে আদমজিসহ শত শত জুটমিল বন্ধ হয়, আরেক দিকে ড. ইউনুস নোবেল প্রাইজ পান– আমরা এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করলে দেখি, উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে ঋণ গ্রহণে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে।

হালখাতা

নোবেল প্রাইজও কি তাহলে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়?

সলিমুল্লাহ খান

'নোবেল প্রাইজ'ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়, তার ঢের প্রমাণ আছে। ['অর্থনীতি বিজ্ঞান'-এ নোবেল পুরস্কার বলে কিছু নেই। অথচ সারা দুনিয়াকে বলা হয়েছে এটাও নোবেল পুরস্কার। যেটা আছে তার আসল নাম 'ব্যাংক অব সুইডেন পুরস্কার'।]

হালখাতা

এবার মঈন চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে চাই, ভাষা কীভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বকে দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে?

মঈন চৌধুরী

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা আমি জোর দিয়েই বলি। আদিকাল থেকে আমাদের মনস্তত্ত্বের গহিনে কতগুলো ভাষাসৃষ্ট টার্ম ঢুকে গেছে যেগুলো দুর্নীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন: চুরি মহাবিদ্যা যদি ধরা না পড়ে, পড়ালেখা করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে, ইত্যাদি। বিষয়টির বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছোটবেলায় আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হল, পড়া-লেখা করলে বড় হয়ে গাড়িতে চড়া যাবে। একই জিনিস আমার সন্তানকেও পড়াচ্ছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে পড়ালেখা করে আমি যদি গাড়ি কেনার মতো টাকা যোগাড় না করতে পারি তাহলে চুরি-ডাকাতির পথ ধরব। এভাবে নানা কথা দ্বারা আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাজগৎ ভরপুর হয়ে আছে। কখনো সচেতনভাবে

কখনো আবার নিজের অজ্ঞাতেই এরূপ ভাষার সূত্র আমাদের দুর্নীতি করতে উৎসাহিত করে। পাওনাদার-এর ভয়ে বাড়িতে অবস্থান করে যদি আমরা আমাদের সন্তানকে বলি– 'বলে দাও বাবা বাড়িতে নেই', তবে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান যে একজন বড় মিথ্যাবাদী হবে, তা প্রায় নিশ্চিত।

হালখাতা

সলিমুল্লাহ খান দুর্নীতির ক্ষেত্রে 'অভাব' ও 'স্বভাব'– এই দু'রকম কারণের কথা বলেছেন। এব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সলিমুল্লাহ খান মানুষের স্বভাব ও অভাবের প্রসঙ্গ টেনেছেন; এই সূত্র ধরে আমি অভাব ও স্বভাবের প্রসঙ্গে আসব। যেমন, বলা আছে 'ভাত নাই যার জাত নাই তার'। প্রশ্ন হল, মোসাদ্দেক আলী ফালু যে দুর্নীতি করেছেন সেটা কি ভাতের অভাবে করেছেন? কত ভাত খায় সে? এখানে আমি মনে করি অভাব নয়, এখানে ফালু সাহেবের স্বভাবটাই দুর্নীতির প্রধান কারণ। আপনি নোবেল প্রাইজের কথা বললেন। তার সঙ্গে আমরা বাংলা একাডেমীর প্রসঙ্গেও আসতে পারি। বাংলা একাডেমী দুর্নীতিপূর্ণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত এবং এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির কর্মপ্রণালী দুর্নীতিগ্রস্ত। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দুর্নীতি অবস্থান করছে এবং এ কারণে পুরস্কার নিয়েও মানুষ এখন হাস্যরস করে, মশকরা করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করার নেই। প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিকে আমরা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও সেটা নিয়ে মানুষ হাসাহাসিই করে। আরও একটি উদাহরণ দেই ভাষা-বিষয়ক। আমাদের সমাজে এটা গ্রহণযোগ্য যে, ভাবী আর ননদের মধ্যে কিংবা বউ ও শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া হবেই; কাজেই দুই নারীর ঝগড়া আমাদের কাছে সহনীয় চিত্র। হাসিনা-খালেদার ঝগড়া সেই কারণে সবাই যেন স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। প্রায় মুহূর্তে ঝগড়া হচ্ছে– কিন্তু জনগণ কিছু না-বলে চুপ করে থাকছে, কিছু জনগণ আবার এই ঝগড়াকে সম্মতি দিচ্ছে তা-ও কিন্তু নয়। কাজেই আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্যারাডাইম যেভাবে তৈরি হয়েছে সেখানে আঘাত করতে না পারলে এই দুর্নীতির বীজ ধ্বংস করা অসম্ভব। সমাজে যারা দৈনিক পত্রিকা, টি.ভি. চ্যানেল, রেডিও চ্যানেল ইত্যাদি মাস-মিডিয়ার মালিক, এরা চাইলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে জনতাকে সচেতন করতে পারবে না, কারণ এইসব প্রচারমাধ্যমের মালিকরা প্রায় সবাই নিজেরাই দুর্নীতিবাজ। আর জনগণকে দুর্নীতিবিরোধী করে তুললে নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে, সেই ভয়ে সংবাদমাধ্যমকে ওরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার কাজেই ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের যে প্যারাডাইম তৈরি হয়ে আছে সেটা ভাঙার জন্য কোনো ব্যবস্থা সমাজে নেই।

হালখাতা

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু পাশের রাষ্ট্র ভারত সেদিক থেকে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলেও আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারত সেখানে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। কারণ সেখানে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ভারতে দুর্নীতি নেই তা বলব না।

হালখাতা

ভারতে দুর্নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ এর কথা বললেন। সেই নিয়ন্ত্রণটা কোথায়?

মঈন চৌধুরী

ভারতে দুর্নীতির ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা হল– ভারতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কারণেই সেখানে একজন কৃষকের তুলনায় আরেকজন কৃষকের চিন্তাভাবনার খুব বেশি পার্থক্য নেই বা বলা যায় এক পেশার লোকের থেকে অন্য পেশার লোক নিজেকে খুব বেশি আলাদা ভাবে না– অর্থাৎ এত জাত-পাতের মানুষ থাকা সত্ত্বেও অন্তত তারা প্রায় কাছাকাছি একটি চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে থাকছে। বাংলাদেশের মতো খুব দ্রুত কোটিপতি হওয়ার কোনো পথই সেখানে খোলা নেই। সেখানে একজন মন্ত্রী-মিনিস্টারও যদি ঘুষ খায় তার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম নিয়ন্ত্রণটা এখানেই, বাংলাদেশে সেটা নেই। ইদানিং বাংলাদেশের 'দুদক' যদি ভারতের সি বি আই-এর মতো শক্তিশালী হয়, তবেই 'নিয়ন্ত্রণ' আসবে কিছুটা।

হালখাতা

তাহলে কি এটা বলা যায়, সুযোগের অভাবে ভারতীয়রা দুর্নীতি করতে পারছে না?

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ সেটা তো কিছুটা বলা যায়ই। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে চুরি, ডাকাতি বিষয়গুলো আছে। একটি দেশের আইন-কানুন এবং তার প্রয়োগের কারণে মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে এবং বিরত থাকতে থাকতেই এক সময় তারা দুর্নীতি না করার জন্য অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভারতসহ অন্যসব দেশে, সেখানে দুর্নীতি কম, সেখানে তারা যে শুধু সুযোগের অভাবে দুর্নীতি করে না বিষয়টি পুরোপুরি তা নয়, তাদের মনস্তত্ত্ব দীর্ঘদিন যাবত তৈরি হয়েছে দুর্নীতি না-করার জন্য। সে জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেও তারা দুর্নীতি করে না। বাংলাদেশে সেই দৃশ্য বলা যায় প্রায় অনুপস্থিত। বাংলাদেশের মানুষের মনস্তত্ত্বটা দীর্ঘদিন ধরে বরং দুর্নীতি করার জন্যই তৈরি হয়েছে।

হালখাতা

তাহলে আপনি কি বলতে চান, ভারতীয়রা দুর্নীতি করে না?

মঈন চৌধুরী

আমি তো বারবার বলেছি, দুর্নীতি করে না, সে কথা বলা যাবে না। তবে তাদের দুর্নীতির ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আছে যা আমি আগেই বলেছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, ইন্ডিয়াতে কনসালটেন্সির একটি কাজের একটি ঘটনা আমি জানি। দিল্লি থেকে হায়দারাবাদ পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরির কাজটি পাওয়ার জন্য সর্বমোট আট লক্ষ টাকা ঘুষ বাবদ বরাদ্দ রাখা হল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কর্তৃপক্ষ দেড় লক্ষ টাকার বেশি ঘুষ নিতে রাজি হল না। কেন রাজি হল না? তার কারণটা ছিল দেড় লক্ষ টাকার বেশি নিলে তারা হজম করতে পারবে না। আমরা টাকা এখানে ব্যাংকে রাখতে পারি, বাড়ি বানাতে পারি, গাড়ি কিনতে পারি কিন্তু ওখানে সেটা সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক টাকা দেখলেই ওখানে টাকার উৎস খোঁজ করা হয়।

সলিমুল্লাহ খান

কেন, তাদের বালিশ ছিল না?

মঈন চৌধুরী

এখন কথা হল, এটা হল কেন? এটা হয়েছে ভারতে দুর্নীতিবিরোধী কন্ট্রোল আছে বলে।

হালখাতা

এবার খান ভাই। মঈন ভাই যে বললেন নানা সমস্যার কথা, বিশেষ করে ভাষা সংস্কারের কথা–এ বিষয়ে আপনি কি একমত? নাকি আপনি অন্য কোনো উপায়ে এর সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন?

সলিমুল্লাহ খান

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি একমত। কিন্তু তিনি যে ভাষাগত সংস্কারের কথা বললেন সেখানে যাওয়ার উপায় কী? সেটা কি একটা অধ্যাদেশ জারি করলেই হয়ে যাবে? বলে দিলেই হবে যে, আপনারা কেউ ভাষাকে এভাবে ব্যবহার করবেন না? আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে না। তাহলে উপায়টা কী? ধরুন জামাই ঘুষ না খেলে মেয়ে বিয়ে দেয়া হয় না। এখানেই তো দুর্নীতির সূত্রপাত। সমাজে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, বলতে হবে জামাই ঘুষ খেলে মেয়ে বিয়ে দেব না। এখন কথা হল– ঘুষ যে উপকারী, ভালো জিনিস– এই চিন্তা আসে কোথা থেকে এটা খুঁজে বের করতে হবে। এটা খুঁজে পেলেই এই পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। 'ঘুষ'-কে যদি সমাজ উপরি-আয় বলে সম্মানজনক অবস্থান দেয়, তাহলে এই ভাষাগত ভিন্নতর ব্যবহারে কাজে আসবে না। দুর্নীতির বিষয়টি ভাষা নয় বরং সেটা আমাদের বাসনার মধ্যেই ঘটে থাকে। এবং কেন ঘটে থাকে সেই পথ বন্ধ করলেই ভাষার সংস্কার সমাজে এসে যাবে। তখনই সৎপাত্রে কন্যা দান করতে আগ্রহ তৈরি হবে– অসৎ পাত্রে মানুষ আর কন্যা বিসর্জন দেবে না– আমি এটাকে...বিসর্জনই বলব। মঈন ভাই বললেন পুরস্কারের কথা। একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন পুরস্কার দুর্নীতি সৃষ্টি করে। তার নাম জাঁ পল

সার্ত্র। সার্ত্রকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হল– উনি নিলেন না– ওই সময় আরেকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল রাশিয়ায়, 'লেনিন পুরস্কার'। সার্ত্র বল্লেন, আমাকে যদি 'লেনিন পুরস্কার'ও দেয়া হয় আমি নেব না। পৃথিবীর অনেক পুরস্কার রয়েছে, সে সব পুরস্কার যে দুর্নীতির আখড়া নয় তার প্রমাণ কী? ধরেন সালমান রুশদির কথা, উনি যদি নিজের ভালো রচনাগুলোর জন্য বুকার পুরস্কার পেয়ে থাকেন তাহলে আমার আপত্তি নেই– কিন্তু আমার অভিমত রুশদি মুসলিম সমাজের নিন্দা করেছেন সে জন্যই তাকে বুকার দেয়া হল। তসলিমা নাসরিনকে যে পুরস্কার দেয়া হল, সেটা সে ভালো লিখে বলে নয় বরং সে বাঙালি নারী হয়েও মুসলিম সমাজের নিন্দা করেছে বলে। সু-লেখক আমাদের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অসুস্থ ছিলেন, সে জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার নিতে বাধ্য হলেন– অথচ আনন্দ পুরস্কার দুর্নীতিগ্রস্ত সে কথা ইলিয়াসও বহুবার বলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সেটা নিতে বাধ্য হলেন। মানুষজন পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ছাড়া কারো বই পড়তে চায় না , তা না হলে বইয়ের গায়ে কেন লেখা থাকে 'আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত'? এসবই দুর্নীতি। আমাদের মঈন ভাই, তিনিও এই পুরস্কার একদিন পাবেন– আমি দোয়া করি । আমি এ-ও দোয়া মানে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই পুরস্কার গ্রহণ না করেন।

মঈন চৌধুরী
আনন্দ পুরস্কার আপনি পেলে...

সলিমুল্লাহ খান
আমি আনন্দ পুরস্কার পেলে কী করব সেটা ভবিষ্যতে বলব। এখন এ বিষয়ে আপাতত কিছু না বলি। তবে আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি– এ পুরস্কার আমি পাব না।

হালখাতা
এই যে আপনি তসলিমা নাসরিন এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা একইসঙ্গে বললেন; তসলিমা হয়তো এমন অবস্থায় ছিলেন না যে তিনি পুরস্কার গ্রহণ না করলে তার বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যাবে– কিন্তু ইলিয়াস যে অবস্থায় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য তার অনুশোচনাবোধ ছিল। এই দু'জনকে আপনি কি এক করে দেখবেন?

সলিমুল্লাহ খান
না ভাই, আমি দু'জনকে এক করে দেখছি না, আমি এ বিষয়ে এখন আর কথা বাড়াতে চাই না।

হালখাতা
আরেকটা প্রশ্ন, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের সম্পদ জিজ্ঞেস না-করে নিয়ে সেটা দ্বারা বিপ্লবের ব্যয়ভার বহন করা– এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সলিমুল্লাহ খান

(একটু উত্তেজিত হয়ে) আমি এখানে কমিউনিজমের নিন্দা করতে বসিনি। সেটা ঘটে থাকলে তার প্রেক্ষাপট দেখতে হবে। এসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, এখন আমরা দুর্নীতি নিয়ে আলোচনায় বসেছি– কাজেই দুর্নীতির বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাই না।

হালখাতা

নিন্দা করার কথা বলছি না, কমিউনিজম নিয়েও সমালোচনা হতেই পারে। জানতে চাচ্ছি যে, এটা দুর্নীতি কিনা।

সলিমুল্লাহ খান

না আমি সেটা মনে করি না। আমি কোনটিকে দুর্নীতি মনে করি শোনেন। লাল বিপ্লবের বিপরীতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা প্রসঙ্গে আসি– একটি যুক্তিসংগত ও মৌলিকভাবে নির্যাতিত মানুষের রাষ্ট্র-দর্শনের বিপরীতে গিয়ে মানুষের বঞ্চনাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য কিছু লোক দরকার হয়– অর্থাৎ যারা সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছে, তাদের পুরস্কার দেয়া হল বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। আমি এটাকে দুর্নীতি মনে করি। যে উদ্দেশ্যে কমিউনিজম চালু হয়েছিল সেটাকে দুর্নীতি মনে করি না, কিন্তু কমিউনিজমের নামে একটা লোক যদি সম্পত্তি দখল করে ব্যক্তিগত ফান্ডে রাখে সেটাকে আপনি কী বলবেন! বলেন তো দেখি কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো'র ব্যাংকে কত টাকা আছে...? ফিদেল কাস্ত্রো আজ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন, তিনি কয় আনা দুর্নীতি করেছেন? কাস্ত্রো'র মেয়েরা কোন মন্ত্রীর পদ দখল করেছেন? তাঁর ছেলেরা কী কী দুর্নীতি করেছে? কেউ বলুক, তাহলে ভাবব, কমিউনিজম মাত্রই দুর্নীতি। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোকে তো নোবেল প্রাইজ, ইংলান্ডের স্যার উপাধি, এর কোনোটাই দেয়া হবে না– এ দ্বারা আমরা কী বুঝব? বাংলা একাডেমীর কথা মঈন ভাই বলেছেন বলে আমি রিপিট করলাম না।...

মঈন চৌধুরী

শুধু বাংলা একাডেমী নয় বাংলাদেশের সকল পুরস্কারই দুর্নীতিগ্রস্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।। সবশেষে একটি বলে আলোচনা শেষ করতে চাই, আমি যে দুর্নীতি প্রতিকারের ক্ষেত্রে সাইকো-থেরাপির কথা বললাম– এর পদ্ধতি কী হতে পারে; আমার মনে হয় আমাদের সমাজ থেকে যদি দুর্নীতি দূর করতে হয়– সেক্ষেত্রে এখন যে পদ্ধতিগুলোকে দুর্নীতি দূর করার উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে, তার আরেকটু গভীরে গিয়ে সাইকো-এ্যানালাইটিকাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্নীতির মূলে গিয়ে সোশ্যাল সাইকো-থেরাপির ব্যাবস্থা করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখতে হবে, আমি আলটিমেটলি সেই দিকটির ওপরই জোর দিতে চাই।

হালখাতা

মঈন ভাই ও খান ভাই, আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ। দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ করা যায়। তবে মঈন ভাইয়ের সঙ্গে আমরাও একমত যে, সামাজিক মানুষের 'মন' দুর্নীতির পক্ষে থাকলে দুর্নীতি দূর হবে না। সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে দুর্নীতির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

উৎস: ' ত্রৈমাসিক হালখাতা' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০০৭, [দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা]।
সমন্বয় ও গ্রন্থনা: শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত